মুক্ত প্রাণের প্রতিধ্বনি
ভোরের কাগজ

আন্দোলনের বিকল্প নেই

মুনতাসীর মামুন

বাংলাদেশের মানুষ এর আগে বহু প্রকার বেহায়া দেখেছে, এরশাদের মতো বিশ্ববেহায়া এখনো দর্শন করছে কিন' এরকম সুপার ডুপার বেহায়া আর কখনো দেখেনি, দেখবেও না। নাম না করলেও সবাই অনুমান করে নিতে পারছেন বিষয় বা ব্যক্তিটি কে? হ্যা, আমি জনাব এম এ আজিজের কথা বলছি যিনি একসময় সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি ছিলেন। বাংলাদেশে কী ধরনের বিচারপতি নিয়োগ করা হয় তার প্রমাণ এম এ আজিজ। তার আগে একডজন বিচারপতির নাম করা যায় যারা এ পদটিকে কলঙ্কিত করেছেন। এর আগে নির্বাচন কমিশনে যতো জন বিচারপতিকে প্রধান নির্বাচনি কমিশনার করা হয়েছিল তারা প্রত্যেকে ঘাপলা করেছেন, সামরিক শাসনকে বৈধ করেছেন। এদের প্রত্যেকেই সামরিক শাসক অথবা স্বৈরশাসক কর্তৃক নিয়োজিত (ব্যতিক্রম নেই তা নয়, তা থাকতেই হবে)। এ জন্য বাংলাদেশে একটি কথা প্রচলিত– এ দেশের সব ধরনের সর্বনাশের মূলে আছে বিচারপতি ও সেনাপতি।

জামাত-বিএনপি আজিজকে চায়, সারা দেশে আর কেউ চায় না। বেগম জিয়া ইতিমধ্যে বলেছেন, নির্বাচন কমিশন নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি না করতে। এটি তার জন্য নেতিবাচক কোনো বিষয় নয়। ইতিবাচক বিষয়। জোটের অন্যতম নেতা ব্যা.না. হুদার ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসেবে তিনি প্রধান নির্বাচন কমিশনারের পদটি পান। এবং নির্বাচন কমিশনকে একটি সার্কাসে পরিণত করেন। এর আগে জোটের অনেক নেতা তার সম্পর্কে নেতিবাচক মন্তব্য করেছেন। এখন অবশ্য সবাই তার পক্ষে। তিনি জানেন জোট তাকে রক্ষার জন্য জান দিয়ে লড়বে এবং তাদের প্রেসিডেন্ট যিনি এখন নির্বাহী তার পিছে আছেন।

ক্রমেই এটা পরিষ্কার হচ্ছে যে, কূটচাল, ষড়যন্ত্র ও নষ্ট বুদ্ধিতে জোট নেতাদের কাছে বিরোধী দলীয় নেতারা নেহাত শিশু। জোট ৫ বছরে দুটি কাজই অতীব যত্নের সঙ্গে করেছে এবং বিশ্বের অন্যান্য গরিব দেশের নেতারা এ থেকে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারেন। এক. টাকা চুরি ভদ্র ভাষায় যাকে বলা হয় দুর্নীতি, যে কারণে বাংলাদেশ তাদের আমলে বারবার দুর্নীতিতে বিশ্বে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। দুই. পরবর্তী ৫ বছর শুধু নয়, ১০ বছর নির্বাচনে জয়ী হওয়া। তারা এ কারণে গত ৫ বছর চরম দমন-পীড়ন চালিয়েছে যাতে তাদের সাজানো বাগানে কেউ হাত দিতে না পারে। তারা কী পরিমাণ নগদ টাকা আত্মসাৎ করেছে তা কখনো জানা যাবে না। বিএনপির সাবেক নেতা ডা. বি চৌধুরী বলেছেন, এর পরিমাণ আড়াই লাখ কোটি টাকা (ভোরের কাগজ ১.১১.০৬)। এর বেশিও হতে পারে কারণ এর মধ্যে ঘরবাড়ি, জমি দখল প্রভৃতির মূল্য ধরা হয়নি। এ টাকা ভোগ করার ও সমাজে কর্তৃত্ব অব্যাহত রাখার জন্য ক্ষমতায় থাকাটা জরুরি।

এর সঙ্গে যুক্ত প্রশাসন মনের মতো করে সাজানো। গত ৫ বছরে অজস্র সরকারি কর্মকর্তাকে চাকরিচ্যুত ও ওএসডি করা হয় যে, তারা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের লোক এবং যারা উপসচিব ছিল তাদের সচিব করা হয়। অজস্র জোট সমর্থককে চুক্তিতে নিয়োগ করা হয়। অন্য কথায়, জোট সরকারকে চুক্তিবদ্ধ সরকারও বলা যেতে পারে। কারণ যাদের চাকরিতে রাখা হয়েছিল তাদের সঙ্গে অলিখিত চুক্তি ছিল তারা 'নিরপেক্ষ' হবে না। হলে চাকরিচ্যুতি। সাবেক অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান বলেছেন, 'আমাদের সাজানো প্রশাসন তত্ত্বাবধায়ক সরকার তছনছ করে দিয়েছে। তবে এ নিয়ে আপনারা চিন্তা করবেন না।' (প্র. আলো ৪.১১), সবাই জানে এ প্রশাসন জোটের জন্য সাজানো তাই নিজের মন্তব্যের সত্যতা প্রমাণ করতে তিনি সাজানো শব্দটি ব্যবহার করেছেন, তবে বাক্যটির পরের অংশ সত্য নয়। কারণ তত্ত্বাবধায়ক সরকার কিছুই তছনছ করেনি। যে কারণে তিনি সমর্থকদেও বলেছেন চিন্তিত না হওয়ার জন্য।

এ পরিপ্রেক্ষিতেই রাষ্ট্রপতিকে সংবিধানের দোহাই দিয়ে সংবিধান এড়িয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান করা হয়েছে। মতিউর রহমান ঠিকই লিখেছেন– 'বিএনপি যখন অনিচ্ছা বা চাপে পড়ে হলেও কোনো বিষয় কবুল করবে, তখন তা হবে সংবিধান সম্মত; আর প্রতিদ্বন্দ্বী দল যখন তার ইচ্ছা-অনিচ্ছা ব্যক্ত করবে, তখন তা সেই সংবিধানের দোহাই দিয়ে ঠেকিয়ে রাখা হবে।'(প্র.আলো ৭.১১.০৬)।

জোটের কৌশল এখনো কাজ করছে। বিটিভিতে জোটের খবরের প্রাধান্য, সরকারের তথ্য অধিদপ্তর ৭ নভেম্বর উপলক্ষে ক্রোড়পত্র প্রকাশ করছে, বিভিন্ন অফিসে এখনো বেগম জিয়ার ছবি ঝুলছে, সেই সব পরিচিত মুখ যারা অত্যাচারের সঙ্গে জড়িত তারাই প্রশাসনের বিভিন্ন কেন্দ্রে বসে আছে। একটা ধারণা দেওয়া হচ্ছে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার আছে বটে তবে তা আমাদের সরকার। সুতরাং, হে জোট কর্মী-সমর্থকরা, তোমাদের ভয়ের কিছু নেই, নির্বিঘ্নে তোমাদের কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাও।

এই কৌশলের অংশ হিসেবে জোট প্রচার করছে– বিরুদ্ধবাদীদের আন্দোলন দেশের দুর্ভোগ ডেকে আনছে এবং বিরোধীরা সহিংস রাজনীতি পছন্দ করে। অন্যদিকে আজিজসহ স্ট্র্যাটেজিক পদগুলোতে নিজেদের মানুষ রেখে নিম্নপদে কিছু রদবদল এবং দেখালো যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিরপেক্ষ থাকছে।

প্রথম কৌশলটি আলোচনা করা যাক। ২৮ তারিখ থেকেই জোটের মালিকানাধীন চ্যানেলগুলো এবং সংবাদপত্রগুলো এই প্রচার শুরু করে যে, দুদিনের অবরোধে মানুষের দুর্ভোগ চরমে উঠেছে। বিরোধীরা আন্দোলনের নামে সহিংস ঘটনা ঘটাচ্ছে। জামাত থেকে এ প্রচার বেশি করা হচ্ছে। কারণ তারা ক্ষুব্ধ এ কারণে যে, গত ৩০ বছরে তাদের দাবি অনুযায়ী জামাতের ৫ জন অনুসারী নিহত হয়েছে, আহতের সংখ্যাও কম নয়। হঠাৎ করে বিদেশী রাষ্ট্রদূতরাও একই কথা বলছেন। কিন্তু সাংবাদিকরা যে প্রশ্নটি করছেন না, তা হলো– গত ৫ বছরে কি মানুষ দুর্ভোগ পোহায়নি? যে দুর্ভোগের মধ্যে মানুষ কাটিয়েছে সে তুলনায় দুই দিনের 'দুর্ভোগ' কি খুব বেশি? গত ৫ বছরে জোট রাজনৈতিক কারণে প্রায় ৪১ হাজার মানুষকে হত্যা করেছে, এর মধ্যে কৃষক ২০ জন। ৫ বছরে মহিলা পরিষদের মতে ধর্ষিত হয়েছে ৫ হাজারেরও বেশি নারী/মেয়ে। ৪০ হাজার সাজাপ্রাপ্ত আসামিকে সাধারণ ক্ষমা প্রদান করা হয়েছে এবং ৭০ হাজার সন্ত্রাসীকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। ডাকাতি, লুট, দখল, চাঁদাবাজি প্রভৃতির সংখ্যা প্রায় সাড়ে ২১ লাখ। ৬০০ স্থানে বোমা ও গ্রেনেড

হামলা করা হয়েছে যাতে মৃত্যু হয়েছে ১৩৭ জনের, আহত হয়েছে ২ হাজার ৩৮ জন। অন্যান্য কথা আর না হয় নাই বললাম। ১০ টাকা কেজির চাল ২০ টাকা খাওয়া কি দুর্ভোগ নয়। আর জামাত? আমরা তো ১৯৭১-এর কথা ভুলিনি। ৩০ লাখ হত্যার এবং কয়েক লাখ ধর্ষণের সঙ্গে এরা জড়িত। জিয়াউর রহমান কর্তৃক পুনর্বাসিত হওয়ার পর তারা রগকাটা রাজনীতির প্রবর্তন করে। বিরোধীদের তারা রগ কেটে হত্যা শুরু করে। গত তিনদিন আন্দোলনের সময় জামাত কর্মীরা বায়তুল মোকাররম থেকে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে গুলি শুরু করে। মাইকে ঘোষণা হতে থাকে। 'মরলে শহীদ, বাঁচলে গাজি।' এসব দৃশ্য আমরা বিভিন্ন চ্যানেলে দেখেছি। আপনারা কি জানেন গত তিনদিনে সারা দেশে ১৭ জন বিরোধী কর্মী নিহত হয়েছে জোটের আক্রমণে? জোটের দশজনও কি না সন্দেহ। আহত অগণিত। না, আমি হত্যার পক্ষে নই কিন্তু আক্রান্ত হলে প্রতিরোধের অধিকার সবার আছে। সরল কথা হলো– তারা মারতে এসেছিল, মার খেয়েছে। সামান্য হলেও। এটি তাদের অহং-এ লেগেছে কারণ গত ৩০ বছর তারা খালি হত্যা করেছে। কেউ তাদের প্রতিরোধ করতে পারে এ চিন্তা তারা কখনো করেনি। গত তিনদিনের আন্দোলনে এটিই প্রমাণিত হয়েছে এরা অজেয় নয় এবং বিরোধী দলের আন্দোলনের এটিই শক্তি। ওয়াহিদুল হক যেমনটি লিখেছেন, 'আজকে যাদের দেখছি তারেকের আগ্নেয়াস্ত্রের সামনে বুক চিতিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে একটা বৈঠা হাতে, সেই তো শতাব্দী মধ্যকার মুক্ত উজ্জ্বল পৃথিবী-নন্দিত বাঙালি এ সম্পৃক্ত ক্ষুদ্রতর জাতিসত্তার নবনির্মাতা।' (ভোরের কাগজ ২.১১)। ঢাকার সাংসদ পিন্টুর এলাকার এক গরিব ছিল আন্দোলনের সমর্থক। এ অপরাধে পিন্টুর ক্যাডাররা তার বাচ্চা মেয়েটিকে গণধর্ষণ করে। পুলিশ চুপ। এই হচ্ছে জোটের চরিত্র।

প্রশাসনে কিছু চুক্তিভিত্তিক পদ বাতিল করা হয়েছে বটে, কিছু উপসচিব, সচিব বদলিও করা হয়েছে। কিন্তু তাতে কি? শোনা যাচ্ছে, উপদেষ্টাদের কাছে প্রস্তাব আছে, বিশেষায়িত পদ থেকে কাকেও সরানো যাবে না। এর মাজেজা বুঝতে পারছেন? উদাহরণ দেওয়া যাক, জামাত কর্মী যিনি চট্টগ্রামের ডিসি থাকাকালীন রোহিঙ্গাদের এ দেশে থাকার বন্দোবস্ত করে দিয়েছিলেন, সেই সাবেক স্বরাষ্ট্র সচিব যার নির্দেশে আমাকে, শাহরিয়ারসহ হাজার হাজার মানুষ গ্রেপ্তার করে নির্যাতন করা হয়েছে, সেই ওমর ফারুক বিআরটিএর প্রধান। চুক্তিভিত্তিক চাকরি কিন্তু তিনি ব্যস্ত এখন ধামরাইয়ে নির্বাচনী প্রচারে। বিরোধীদের নাজেহাল করার পুরস্কার হিসেবে তাকে এমপি নির্বাচনে মনোনয়ন দেওয়া হচ্ছে জোট থেকে। তার চুক্তি কিন্তু বাতিল হচ্ছে না। এক সচিবকে আরেক সচিব পদে বদলি করা হচ্ছে। বিএনপির মুখপাত্র দৈনিক দিনকালের রিপোর্টার যিনি এখন প্রেস সচিব এবং সামরিক সচিব উপদেষ্টারদের বৈঠকে বসছেন যা অশ্রুত। বিএনপির দুই মহাভক্তকে আইজি ও র‌্যাব প্রধান পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছেন। বাংলাদেশের নষ্ট মানুষ হিসেবে পরিচিত যিনি সংবিধান বিনাশে সহায়তা করেছে তার বাড়ির গেটে গুলি লাগলে হন্তদন্ত হয়ে স্বরাষ্ট্র সচিব ও পুলিশ কর্মকর্তারা ছুটে যান। অথচ শেখ হাসিনা বা ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূতকে হত্যার জন্য যখন গ্রেনেড ছুড়ে বহু লোককে হত্যা করা হয়, এরা কেউ তখন জায়গা ছেড়ে নড়েননি।

উপদেষ্টারা বলছেন, তারা এসব ব্যাপারে কিছুই জানেন না। কিন্তু তাই বলে তাদের দায়-দায়িত্ব তো এড়ানো যাবে না। জোট থেকে যা হুকুম করা হচ্ছে রাষ্ট্রপতি তাই করছেন। তাই তো তার করার কথা। প্রয়োজন ছিল সব সচিবকে ওএসডি করা ও পরবর্তী কর্মকর্তার ওপর মন্ত্রণালয়ের ভার ন্যস্ত, ওএসডিদের পদায়ন। না হলে লক্ষ্মীপুরের এসপি/ডিসিকে কুমিলায় এসপি/ডিসি হিসেবে বদল করলে লাভ কী? বিষয় তো একই থাকছে। আর এম এ আজিজ? শোনা যাচ্ছে, আরো নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ দিয়ে আজিজকে 'নিরপেক্ষ' করা। এটি শুধু হাস্যকর নয়, ষড়যন্ত্রমূলকও বটে। ওরা চারজন

থাকলে আরো পাঁচজন নিয়োগ দিয়েও কি কাজ করা যাবে। আমাদের বিশ্বাস করতে হবে যে রাষ্ট্রপতি খুনের আসামির ফাঁসি রদ করতে পারেন, তিনি এম এ আজিজ নামক ব্যক্তিটিকে সরাতে পারেন না? তিনি বলছেন, এ ব্যাপারে তিনি কিছু করবেন না। এমনকি তার নির্দেশে দুজন উপদেষ্টা গিয়েছিলেন শেখ হাসিনার সঙ্গে আলাপ করতে। জোট নেতারা এ কারণে তাদের পদত্যাগ দাবি করছে অথচ রাষ্ট্রপতি একবারও বলছেন না তিনিই এদের পাঠিয়েছিলেন। আশঙ্কা করছি ১১ তারিখ আবার হাসিনার কাছে রাষ্ট্রপতি দূত পাঠাবেন, বিউটি আপাও যাবেন এ তদিবর করতে যে প্রশাসনকে 'নিরপেক্ষ' করার জন্য আরো দিন দশেক সময় দেওয়া। তারপর বলা হবে, সময়তো আর নেই নির্বাচনে আসুন। এবং শোনা যাচ্ছে, হয়ত ভুল, যে বিরোধী দলেও একটি লবি আছে যারা যেনতেন প্রকারে নির্বাচনে যেতে রাজি। তারা জানে না, এতে বিরোধী দলের যে ক্ষতি হবে তা তারা আর পুষিয়ে উঠতে পারবে না।

জোটের কৌশল খুব সরল, তাদের টার্মসে বা মতানুযায়ী যদি নির্বাচন না হয় তা হলে তারা নির্বাচনে যাবে না। কারণ নিরপেক্ষ, স্বচ্ছ নির্বাচন হলে জোট নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। এতে যদি গোলযোগ হয়, হবে, তাদের কাছে প্রচুর অর্থ ও অস্ত্র মজুদ। গুঞ্জন চলছে, এরকম পরিস্থিতি হলে সামরিক শাসন হবে। ক্যান্টনমেন্টে এখন জনকণ্ঠ, যুগান্তর প্রভৃতি পত্রিকা যেতে দেওয়া হয় না। সুতরাং বুঝতেই পারছেন। না হয় সামরিক শাসন হলো তাতে কি? রাশেদ খান মেনন এ বিষয়ে ভালো বলেছেন। তার মতে, এসব জুজুর ভয় দেখাবেন না। সামরিক শাসন বহু দেখেছি। তাদের কীভাবে বিদায় করতে হয় তা আমরা জানি।

বিরোধী দলকে আন্দোলনের মাধ্যমেই নিরপেক্ষ প্রশাসন ও নির্বাচন কমিশন এবং পরিবেশ ঠিক করে নির্বাচনে যেতে হবে। এর কোনো বিকল্প নেই। এ পরিস্থিতিতে বিএনপি-জামাত নির্বাচনে যাবে না যদি না তাদের প্রচ্ছন্ন সমর্থক নিরাপত্তাবাহিনী ও বিউটি আপার দেশ বাধ্য করে। আর বিরোধীদের দাবি না মানার পরও যদি বিরোধীরা নির্বাচনে যায় তাহলে তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। পরিস্থিতি এখন ঠিক এরকম।

এ পরিস্থিতি চলতে থাকলে পরিণামে যদি সংঘাতময় পরিস্থিতি হয় তাহলে অবশ্যই এর জন্য দায়ী হবেন তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান ও উপদেষ্টারা। এরপর তাদের অবস্থা হবে লতিফুর রহমানের মতো। ঘর থেকে বেরুতে পারবেন না। এ পরিস্থিতি ভালো, না ঐ পরিস্থিতিতে পদত্যাগ করা ভালো সেটি উপদেষ্টারা বিবেচনা করে দেখবেন। রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিনের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

মুনতাসীর মামুন : অধ্যাপক, ইতিহাসবিদ।